মিলনসাগর
www.milansagar.com

আপন জন

চন্দনা দত্ত

বঙ্গীয় সংসদ আয়োজিত সাংবাৎসরিক আলোচনাচক্রে বহু বিদগ্ধ বিষয়, আর্থসামাজিক নানা পরিস্থিতি, জীবন নিয়ে সাহিত্যের বহুদা বিকাশ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। কৃতবিদ্য, প্রথিতযশা পণ্ডিতগণ অংশ গ্রহণ করেন। রাজধানীর সংস্কৃতমনস্ক মানুষের কাছে সাংসদ অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

আজকের সভার প্রকৃতি, পর্যালোচনা ভিন্নতর। আমাদের আলোচ্য বিষয় একান্ত আপনজন বটুকদা, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। করোলবাগের সব পথ যার চলায় ধূলায় ধূলায় ধূসর হয়েছে। বর্ণাঢ্য হয়েছে। সঙ্গীতে সঙ্গীতে ভরে দিয়েছেন আকাশের আলো, বাতাসকে। আটপৌরে সাধারণ গৃহস্থালির মুহূর্ত প্রাণবন্ত হয়েছে; রচিত হয়েছে অসাধারণ কবিতা। জীবনের অনুপল ও বৃহতের সমন্বয় শিল্পমহিমায় উজ্জ্বল হয়েছে। নাজির হাসান, কুসমীদাসী, রাখুরাম, ডাকসাজের অভিরাম পাল, একটি শুভ্রফুল জন্মের মধ্যে জন্মান্তরে ঘটিয়েছে। ব্যক্তিক অনুভবে অনেক জীবন আপন হয়েছিল। নিজস্ব ব্যক্তিমানস থেকে সামাজিক বহুমাত্রিক বিভিন্নতা, তাঁর শিল্পীসত্তা, তাঁর একাকিত্ব, আত্মীয়তা, প্রতিবাদ, খণ্ড-অখণ্ড সত্তার নিত্যপ্রবাহ দিয়ে ঘিরেছিলেন জীবনের উৎসবকে সৌন্দর্যকে।

মানুষটি আমাদের-ই একজন। আপনজন। আমরা সকলে প্রতিবেশী। দৈনন্দিন জীবনের সুর এক তারে বাঁধা, যেন বাড়ির কাছেই আমাদের আরশীনগর। তিনি সকলের ঘনিষ্ঠ, আপন, আমাদের শিল্প চেতনার অভিভাবক। সর্বদা সামান্যভাবে থাকলে অসামান্যকে চিনে ওঠা যায় না। নিজের সম্পর্কে প্রায়ই তিনি ছিলেন অনুচ্চারিত।

তাঁর শিল্পী সত্তাই মুখ্য। সেই সত্তাই উপভোগ করেছেন সকল বন্ধুজন। আপনজনেরা। আমরা গড়ে উঠেছি, বেড়ে উঠেছি সেই অফুরন্ত প্রাণবন্ত সান্নিধ্যে। জীবনে অনেকবার স্থান পরিবর্তন করেছেন। সাংসারিক দায়িত্বকে সহাস্যে মেনে নিয়েছেন। কোলকাতার পর দিল্লীর উষরভূমি। আবার কোলকাতা, কারণ সবাইকে তো একদিন কেন্দ্রে ফিরে যাওয়া চাই। শেষ যাত্রা বড় নীরব। কোলাহল নেই। কোনও দাবি বিরত। এক জীবনাশিল্পী শেষ মহলে পৌঁছে কেমন একা অশ্রুনদীর সুদূর ঘাটের পারে, জীবনদুয়ারটুকু পার হয়ে গেলেন।

পাবনার শেতলই জমিদার বংশে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের জন্ম। ছোটবেলা থেকে নাহোক কোনও রোগে খুব ভুগতেন। বটুকেশ্বর শিবের দোরে মা ধরনা দিলেন। নাম হ'লো সেই শিবের। নামের মহিমা আক্ষরিক ভাবে সত্য হয়েছিল। সর্বদা মুক্ত পুরুষ। স্বচ্ছ বয়ে যেতেন।, কোনও চিন্তায় পীড়িত দেখিনি। যৌবন অতিক্রান্ত দিনে দিল্লীর ভারতীয় কলাকেন্দ্রের ডাকে নতুন জীবন বাঁধলেন। কবি, গায়ক, সুরকার খ্যাতিতে কোলকাতার শিল্পীমহলে তখন তিনি দীপ্তিমান। গণনাট্যের মুক্ত আন্দোলনে সারা দেশের শিল্পমানস তখন মুহুর্মুহু সৃষ্টির আবেগে

এই লেখাটি ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ সালে, নতুন দিল্লির "কল্লোলবাসী বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের ২০০৭ সালে ডঃ নবেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

অস্থির। যে কয়জন ভগীরথ নবগঙ্গার অবতরণ ঘটালেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায় তার মধ্যে স্মরণীয়। নবজীবনের গান, মধুবংশীর গলি-র মত অবিস্মরণীয়, আবার কাঁচের স্বর্গ, মেঘে ঢাকা তারা, বিখ্যাত চলচ্চিত্র সঙ্গীতকার হিসেবে তিনি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। দিল্লীর ভারতীয় কলাকেন্দ্রেও রামলীলার সঙ্গীতকার হিসেবে অসামান্য সুরসৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন। কলাকেন্দ্র আজও সেই সুরের ধারা বহন করে চলেছে। ইতিপূর্বে গণনাট্য আন্দোলন পর্বে কিছুদিন বম্বে ছিলেন। সুর নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষাও সেই পর্বে। আগেই বলেছি জন্মসূত্রেই তিনি যেন বৈরাগী। কোনও বন্ধন স্বীকার করেননি। কর্তৃপক্ষের শানবাঁধানো অনুশাসনে বাঁধা পড়া তাঁর অসাধ্য। কলাকেন্দ্রের বাঁধন থেকে মুক্ত করলেন নিজেকে। আবার চল্লো নতুন পথের সন্ধান। রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুরু হিসেবে নতুন জীবনের সেই থেকে শুরু।

অনেকদিন আগে নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনের মাতা শ্রীঅমিতা সেনের এভুজ বক্তৃতামালা পড়েছিলাম। শান্তিনিকেতনের আশ্রমকন্যা। দেশবিদেশ জুড়ে রবীন্দ্র অনুরাগী মানুষেরা ছড়িয়ে আছেন। কোলকাতাতেও আছেন গুণমুগ্ধ মানুষেরা। কবিকে নিয়ে তাঁরা করতে চান নানা আয়োজন। বিদগ্ধ পণ্ডিত। শিল্পমনস্ক মানুষেরা কবির সঙ্গসুধা উপভোগ করতে চান। কবির ডাক আসে। নিরাশ করতে পারেন না। শান্তিনিকেতন পরিধির বাইরে তাঁর অবস্থান ঘটে। লেখিকার কোনও বিরোধ নেই তাতে। পাণ্ডব পাণ্ডব থাক, কৌরব কৌরব— অর্থাৎ ঈর্ষা নাহি করি কারে। আশ্রমকন্যারা অনেক বেশি ঐশ্বর্যশালিনী। তাঁরা কবিতা লেখেন না, বিদগ্ধ আলোচনায় অংশ নেন না বটে, কিন্তু তুচ্ছ নন। কারণ তাঁরা কবিকে পেতেন পরম আত্মীয়রূপে। মঞ্চের দূরত্বে কখনো নয়। প্রভাতের সূর্যোদয়ের অমলিন আলো আর সূর্যাস্তের কোলাহল স্তিমিত শান্তির মত। কোনও ব্যবধানে নয়। রোজ তাঁরা দেখতেন কবিকে। রোজ গান শুনতেন। তাঁদের মত করেই কথা কইতেন। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে আলোচনা হ'ত। উপদেশ পেতেন। কোনও পাণ্ডিত্যের আড়াল নয়। আপনজন তবে কাকে বলে! করোলবাগে বটুকদার সঙ্গে আমরা ছিলাম সেইমত। বটুকদার কাছে ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায়, শম্ভু মিত্র, মৃণাল সেন, কত প্রথিতযশা মানুষের সম্ভাষণ, অনুরোধ— সবচিঠি দেখেছি। সে সারিতে আমাদের স্থান কই। তবু নতুন নই। আমরা পেয়েছিলাম ভালোবাসা বিলোবার আটপৌরে পরিবেশে অসাধারণ বন্ধুকে।

সম্ভবত ষাটের গোড়ার কথা। তার আগে পরিচয় ছিল না। দূর থেকে দেখেছি। করোলবাগ সভায় গান গাইতে শুনেছি। আমার ভাব জন্মেছিল বটুকদা পত্নী উর্মিলাবৌদির সঙ্গে। কোলে সমবয়সী শিশু। বটুকদা তখন বাড়িতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখান। গিয়েছিলাম বৌদির কাছে। ঘরের মধ্যে ক্লাশ। খুব মন টানছিল। সেই টানে বসেই আছি। ক্লাস শেষে বটুকদা বেরিয়ে এলেন। বৌদি পরিচয় দিতে বল্লেন, চলে এসো আমার ক্লাশে। আমাকে পায় কে! গুরুর ডাক বলে কথা। প্রথমদিনে গান শুনতে চাইলেন। গাইলাম, মেঘ বলেছে যাব যাব। এতদিনের উজান ঠেলে চোখের পরে সব যেন সাজানো ছবি। বটুকদা তখন বাড়ির ক্লাশছাড়া অন্যত্রও শেখাতেন। বাড়ির ক্লাশে আশ্রয়তো হলো আমার। তেমনি আশ্রয় হ'লো পরিবারের একজন আপন মানুষ হিসেবে। আমাদের ঘরেও হ'লো তার নিত্য আত্মীয়তা। নিবিড় বন্ধন। অচেনার জড়তা কখন মুক্ত হ'লো। শেষ পর্যন্ত ঘরের মানুষ থেকে গেলাম।

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থে, ২০০৭ সালে ডঃ নবেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

গানের ক্লাশের কথা দিয়েই আরম্ভ করি। সপ্তাহে দু'দিন হ'ত। ছাত্রীদের যেন তর সইতোনা। ছাত্র তেমন নয়। নতুন গানশোনা ও শেখার আগ্রহ আজও মনে সুর তোলে। সাধারণত প্রকৃতির পরিবর্তন নিয়ে গান হ'তো। পূজা ও প্রেম বা স্বদেশের গান অবশ্যই থাকতো। বিশেষ কোনও ঘটনা উপলক্ষে উপযোগী গান শিখতাম। শিক্ষাপদ্ধতি ছিল একান্ত নিজস্ব। হারমোনিয়াম বাজিয়ে শেখাতেন। সবদিনই যে গান হতো তা নয়। কোন কোন দিন আবৃত্তি। তার মতে একটি অপরের পরিপূরক। সাহিত্যের প্রতি উদাসীন থেকে এ বিদ্যা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থী নিজে অপারগ হলেও, শুনলেও রসাস্বাদনে উপকৃত হবে। এমনি এক ক্লাসে পাঠ করলেন পৃথিবী কবিতা। 'স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি পুরাতনী, তুমি নিত্যনবীনা'— আবৃত্তিতে ঝড়েছিল একসঙ্গে আনন্দ ও অভিমান। হয়তো নাটক তিনি করেছেন গণনাট্য অথবা অন্য কোনও স্থানে। সংলাপও বলেছেন। কিন্তু তার প্রাণঢালা আবৃত্তির শ্রোতা আমরা ছাত্রদল কয়েকজনা মাত্র। যেমনভাবে গান চলতো আবৃত্তি অন্যভাবে। কে কোথায় আসবে, কোথা থেকে পরবর্তীর আরম্ভ, আগে থাকতেই বলে দিতেন প্রতিটি কথা ও ধ্বনির সম্মান এবং নাটকীয় গুরুত্ব বুঝিয়ে দিতেন। কথার মধ্যে নাটকের প্রাণ-সঞ্চার করতে বলতেন। গানের সুর যেমন আরোহণ, অবতরণ করবে তেমনি দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের গানের চলা বহমান রাখতে হবে। অন্তরা, সঞ্চারী আভোগ যেন সঙ্গীতের বিভাগ মাত্র নয় চিত্রশিল্পের মত ধীরে ধীরে বর্ণিকাভঙ্গম ঘটবে। একটি ঢেউ যেমন পরবর্তী ঢেউটিকে সম্ভব করে তোলে, সঙ্গীতও তেমনি। সুর ও কথা মিলে মিশে এক অমোঘ পরিণতি অথবা দর্শনে শ্রোতাকে পৌঁছে দেবে। শিল্পীর সেই দায়িত্ব। সুরে বদ্ধ প্রতিটি শব্দের প্রাণ আছে। অনুভবের জন্য নিবিষ্ট হতে হয়। একটি প্রস্ফুটিত ফুলের মত। পাপড়িরা যেমন সকলেই আলাদা, কিন্তু বিচ্ছেদ নয়। উচ্চারণের মধ্যে প্রাণ থাকা চাই। তবেই বিচ্ছিন্নতা হবে না। বেসুরো বাজবেনা। সুরে কথায় গাঁথা দৃশ্যপটের নান্দনিক তত্ত্বের নাটকীয়তাকে একত্রিত করার শিক্ষণ দিতেন। অর্থাৎ একনিষ্ঠ শিক্ষা, সঙ্গীত তাঁর কাছে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। পথে চলতে চলতে তাঁকে গুণগুণ করে গান গাইতে বহুজন শুনেছেন।

তাঁর শিক্ষার্থীরা অনেকেই সঙ্গীতের এই চিত্ররূপের প্রাণময়তা নিশ্চয় গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

আর একটি কবিতার কথা মনে পড়ে। 'ঢাকীরা ঢাক বাজায় খালেবিলে/বুক ফাটানো এমন খবর ছড়ায়।' সেই কালের সামান্য একছড়ায় কবিতাটিকে কয়েকটি গানদ্বারা সাজানো হ'লো। কিছু আবহসঙ্গীত। আগেই বলেছি জীবনের কলাকৌশল সম্পর্কে তিনি চিরকালীন উদাসীন। অনুষ্ঠানে কার কতটা এগিয়ে বসা প্রয়োজন অথবা মাইকের স্থাপন বিন্দুরই ব্যবস্থা নেই। নিজে কোনও অপ্রীতিকর কথা বলতেন না। তেমন আমাদের অভ্যাস হয়নি। আমরা কেউই তেমন অনুগামী নই যে অনুষ্ঠান চলাকালীন নির্দেশ বা ইঙ্গিত বুঝে নেব। হয়তো তিনি আশা করতেন। শেষ পর্যন্ত তেমন আঁটবাঁধা গেল না। ক্ষতি কিছু হয়নি। একটি কবিতাকে স্তবকে স্তবকে আলাদা করে দেখা এবং উপযোগী গান দ্বারা পুনরায় গঠন করা শেখা হ'ল।

একবার বঙ্গীয় সংসদের পূজার নাটক হবে সংক্রান্তি। মহড়া চলছে তরুণদার (প্রয়াত বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ সদস্য, তরুণ চক্রবর্তী) বাড়ির খোলা ছাদে। প্রতাপদার (বিখ্যাত নাটক নির্দেশক,

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "কল্লোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নবেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

শিল্পী ও চলচ্চিত্র অভিনেতা প্রতাপ সেন) নির্দেশে মহড়া জমজমাট। মহড়ার সময়ে কোনও কড়াকড়ি ছিল না। সন্ধ্যের পর অবকাশমত যার যেমন ইচ্ছে চেনা মানুষেরা ধার ঘেষে বসে পড়তেন। পুরোহিতের ভূমিকায় বটুকদা। নাটকটি হয়তো অনেকের মনে আছে। সেই পুরোহিত— যে জমিদারপুত্র ও ভৃত্যপুত্রের একই সময়ে ভাগ্য গণনা করছেন। জোর তালিমে পার্ট মুখস্থ চলছে। সপ্তাহে দুদিনের ক্লাস। সেখানে প্রায়ই গরহরজির। কখনো বা সময়ের আগেই ক্লাশ শেষ। সময় হতেই বলতেন— এসো এসো। এবারে এসো সব। দুহাতে মাথা চাপড়িয়ে বলতেন আমার যে শিরে, এখন আমার শিরে।

হাসি দেখেই বুঝতাম ছুটবেন মহড়ার দিকে। আগেই বলেছি খুব স্পর্শকাতর ছিলেন। শিল্পীর যেমন স্বভাব। জ্বরে পড়লেন। টিকিসুদ্ধ পরচুলা পড়া আর হ'লো না। অবশেষে শেষরক্ষা করলেন স্বয়ং ডাইরেক্টার।

আর একটি ক্লাসের কথা কখনো ভুলবো না। বর্ষার গান, কেদারারাগ আধারিত মেঘছায়ে সজল বায়ে। ঘরে বাইরে উপযুক্ত পরিবেশ। গাছটিকে সাজাবার জন্য প্রকৃতির নিপুণ সজ্জা। ঘন ঘন বিদ্যুৎ। ঘরের মধ্যে ছাত্রীদলের উতলা হবার উপযুক্ত কারণ ঘটতে যাচ্ছে। গুরুমশাই হঠাৎ পড়া ধরতে শুরু করলেন। এমন বিপদ ঘটতো কখনোসখনো। গানটির চিত্রকল্প মনোহররূপে আমরা মুগ্ধ। আয়ত্ত তেমন হয়নি। গুরুআদেশ অমান্য হবার নয়। সাধ্যানুযায়ী সকলে গাইলাম। মাথা নীচু করে বসে আছেন। যেন গভীর ভাবনায় পড়েছেন। আঙ্গুল স্তব্ধ। পড়া যে কতটা উতরালো বুঝতে আর বাকি রইলো না। ভাবছি, তিরস্কার কেমন হবে। গুরুতো যেমন তেমন নয়। কঠিন করে বকতেই জানেন না। উচ্ছল, উজ্জ্বল পরিহাসের ভাণ্ডার ছিল অপরিমিত। খুব ধীরে মন দিয়ে বললেন, এতটা স্বাধীনতা নেওয়া কি ঠিক হ'লো। লজ্জায় এবার আমাদের মাথা নীচু। বুঝলাম কিছুই হয়নি। আজকের মুক্ত রবীন্দ্রনাথ জোয়ারে আমাদের অশুদ্ধ গানখানির হয়তো দাবি বেশি হ'ত। গুরুর কাছে সঠিক শেখার প্রয়োজনতো বানের জলে ভাসা খড়কুটো।

একদিন ক্লাসে আসতে বেশ দেরি করেছেন। চলে আসবো আসবো ভাবছি। আধ পথে হঠাৎ প্রবেশ। যেন মস্ত ভুল হয়ে গেছে। আস্তিন গুছিয়ে ধুতি গুছিয়ে নিয়ে হারমোনিয়াম কোলের কাছে যেন রনং দেহি। গান বাছাবাছি নয়। আর সময় যেন না পালায়। আজ এসো, একটা একটা বীরত্বের গান হোক। আমাদের মনে বেশ ঝনঝনিয়ে বীরভাব জেগে উঠুক। অনুনয় নয়, বিনয় নয়। দাবি জানাতে হবে। আনেক আলো জ্বলে উঠবে। অন্ধকার দূর হবে। বীর্যের গান, বলের গান শিখলাম। মুক্ত গলায় দৃপ্ত সৈনিকের মত শেখালেন 'বাঁধা দিলে বাঁধবে লড়াই।' প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যুতে সারা দেশ জুড়ে শোকের ছায়া। আমাদের ক্ষুদে ক্লাসে শোক জ্ঞাপন হ'লো পাঁচ মিনিট মৌনী। সেদিন শিখেছিলাম "ওগো কিশোর আজি তোমার দ্বারে পরাণ মম জাগে।"

গানের ভিতর দিয়ে বটুকদাকে দেখেছিলাম অতি ঘনিষ্ঠভাবে। বহু অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। সঙ্গে নিয়েছেন ছাত্রদের। নবজীবনের গানে ডাক পড়েছে। এসো মুক্ত কর, মুক্ত কর অন্ধকারের এই দ্বার। সংগাচ্ছধং সংবদধং-মন্ত্র সঙ্গীত শিখিয়েছেন কত যত্নভরে। শুধুমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত পাঠক্রম নির্দিষ্ট ছিল তা নয়। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত রচনা 'স্বাধীনতা হীনতায় কে

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "কল্লোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নবেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

বাঁচিতে চায়', তাঁরই সুরারোপণ। এখনো নিশ্চয়ই ছাত্ররা উদ্দীপনাময়, আবার পরাধীনতার অন্ধকার ক্লেশময় সে গান ভুলতে পারেননি। কোনও অনুষ্ঠানে গাইবার জন্য শিখলাম ইকবালের বিখ্যাত গান। সাঁরে যাঁহা সে আচ্ছা।

সেবারে উত্তরবাংলায় অস্বাভাবিক বৃষ্টি। উত্তর বাংলা ও আসাম প্রায় জলের তলায়। যে কোনও দৈবদুর্বিপাক অথবা রাষ্ট্রীয় কোনও প্রয়োজনে বঙ্গীয় সংসদ সর্বদা এগিয়ে এসেছেন। সংসদের কর্ণধার তখন শ্রীযুক্ত অবনী লাহিড়ী। তাঁর অভিধানে অসম্ভব বলে কথা ছিল না। এমন কর্মবীর একনিষ্ঠ মানুষটির পরিচয় যারা পেয়েছেন আশা করি এখনো তারা বিরল নন। আমার সঙ্গে একমত, উত্তরবঙ্গ ত্রাণকার্যে বঙ্গীয় সংসদ নির্লিপ্ত থাকবে এমন হতেই পারে না। তড়িঘড়ি ব্যবস্থা। সংসদঘরে একপাশ জুড়ে রাত জেগে তৈরি হচ্ছে ভিক্ষাপাত্র, অন্যদিকে বটুকদা আমাদের শেখাচ্ছেন মিছিলের গান ধনধান্যে পুষ্পে ভরা। ১৯৬৮ সাল। অবনীদার আহ্বানে আমাদের সঙ্গে পদযাত্রায় যোগ দিলেন পদ্মজা নাইডু, কৃষ্ণমেনন, হীরেন মুখোপাধ্যায়, ত্রিগুণা সেন। সে দৃশ্য ভোলার নয়। দিল্লীর পথে পথে ত্রাণকার্যের জন্য এমন মিছিল আর হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সংসদ আজ পর্যন্ত নিরলসভাবে এই ব্রত পালন করে যাচ্ছেন। কত যত্ন নিয়ে বটুকদা আমাদের সকলের জানা গানটি শেখালেন। প্রাণসঞ্চার করলেন গানে। খুব টান টান অর্থাৎ ঋজুভাবে গাইতে হবে। কোনও ঝোঁক নয়। নয় কোনও আয়েসের ক্ষীণসুর। কোনও দুর্বলতা দেখানো নয়। বীরের মত স্বদেশের জয়ধ্বনি। আমরা চলেছি বহু দরজায় আঘাত করতে করতে। হাটুরে আর দোকানি মানুষদের ঘুম ভাঙ্গাতে হবে। লাভ লোকসানের ঊর্ধ্বে আছে মানবিকতা। মন ফেরাতে হবে সেইসব মানুষের। আমাদের ভিক্ষাপাত্র ভরতে হবে। উদ্দেশ্যকে মহান করে তোলার জন্য এ গান। সাইকেলের পেছনে বাঁধা হারমোনিয়াম। চুনীদার (প্রয়াত চুনী রায়চৌধুরী) হাতে সাইকেল। কখনোসখনো হাত বদল। আমাদের সঙ্গে বহুজন গলা মিলিয়েছিলেন। বুকী দা, (শ্রীসুখেন বোস) চুনীদার কথা মনে আছে। তখনতো মাইক নেই। তাতে কী হ'লো। উৎসাহের জোয়ারে সব ভেসে গেল। পথচারীরা দাঁড়িয়ে পড়ে গান শুনেছেন। মুক্ত হস্তে দিয়েছেন দান। প্রচুর অর্থ ও কাপড় সংগ্রহীত হয়েছিল, বঙ্গীয় সংসদ পরেও এমন মিছিল আরো করেছেন। সংসদের সে কর্মোদ্দনা ভুলবার নয়।

বাকচাতুর্যে ও পরিহাসে মুহূর্তে উজ্জ্বল পরিবেশ তৈরি করতে তাঁর জুড়ি ছিল না। বিখ্যাত ভাস্কর শ্রী চিন্তামণি করের সার্থক ছাত্র শ্রীবিমান দাস (সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত কলকাতা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ) তখন আমাদের বাড়ির খোলা উঠানে মূর্তি বানাতেন। কাঠ ও পাথর সবরকম মাধ্যমের কাজ। শিল্পী সান্নিধ্য বটুকদার ভারী প্রিয়। জায়গাটি ঘিরে ফুলের অসীম দাক্ষিণ্য। অনেক গুণীজন এসে যেতেন। আসর জমজমাট। সঙ্গে শিল্পীর বাটালিহাতুড়ির আবহসঙ্গীত। শিবুদা (দরবেশ, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক প্রয়াত শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়), শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ (বিখ্যাত ব্যঙ্গ চিত্রকার, কবি), প্রয়াত শিল্পী নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রয়াত শিল্পী হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য (নাড়ুবাবু— পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টেন্ট চলচ্চিত্রের কাহিনীর ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন চলচ্চিত্রের অভিনেতা। দাদুরী ভট্ট চরিত্র সৃষ্টি করে অ্যানিমেটেড কার্টুন ছবির সৃষ্টিধর), ললিতকলা আকাদেমির সম্পাদক এম. এ. কৃষ্ণান কেউ বাদ যেতেন না। গান তো চলতোই। কখনো কখনো আবৃত্তি। সদ্য লেখা ইরান জার্নাল থেকে শিবদা পাঠ করতেন। কত

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ সালে, নতুন দিল্লির "কত্রালবাস বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, সজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নবেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া

মিলনসাগর
www.milansagar.com

যে প্রসঙ্গ। ইতালীয় রেঁনেসা থেকে অজন্তা বাগ ঘুরে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা কবিতা। বটুকদা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গুণমুগ্ধ ছিলেন। কখনো সখনো না ঢুকেই দরজায় দাঁড়িয়ে সটান ডাক— সোনার মাছি খুন করেছি।

সস্নেহে বিমানকে ডাকতেন বৈমানিক পরিস্থিতি। সে নামেই ডাকতেন। চিঠি লিখতেন। কবিতা লিখেছেন বৈমানিক পরিস্থিতি নিয়ে। গৃহকর্তার স্কুটারে বেড়াবার ভারী সখ। স্কুটারের নাম হ'লো 'অজিত বিক্রম'। বটুকদার আর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু 'সুকুমার চক্রবর্তী'। অতি বলিষ্ঠ, লম্বা ও সুঠাম দেহ। যৌবনে স্বদেশী করতেন। জেল খেটেছেন বহু। তাঁর নাম হ'লো বীরবিপ্লবী। সাদা খদ্দরের ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবিতে সর্বদা শোভিত। আসল নাম গেল তলিয়ে। বীরবিপ্লবী দাদা বলে ডাকতাম। ছাতামাথায় দু'জনে সাধারণত একসঙ্গে আসতেন। সদ্য কথা ফোটা এক শিশু বাড়িতে। যা দেখে তাতেই প্রশ্ন 'এটা কি' অক্ষম উচ্চারণে যা দাঁড়ালো 'এটা টি'। শিশুর নাম হয়ে গেল 'টি'। তিনি হ'লেন টি জেঠু আদরের আধিক্যে যা কখনো শুধুই 'টা'।

হাঁড় কাঁপানো শীতের রাত। চারদিক নিশুতি। যে যার ঘরে ঢুকেছে নিশ্চিন্ত উষ্ণতার জন্য। দুয়ারে আগন্তুকের সাড়া। চিনতে ভুল হয় না। এমন রোমান্টিক অতিথি। 'গৃহস্থের জয় হোক! আমি তোমার পিসিমা হই।' বলতে বলতে ঢুকলেন। শেতলার বাড়ির কথা শুরু হয়ে গেল। এমন কত যে ঘটতো সেকালের দিন ঘিরে। হাতের তলায় কাপড়ের পুটলি চেপে ধরে অচেনা অজানা মানুষটির হঠাৎ প্রবেশ।

অতিথির হঠাৎ আগমন। একটা সম্পর্ক কিছু পাতালেই হ'লো। অর্থাৎ আপাতত কিছুদিনের আমার এই ঠিকানা। তেমনি শীতে জমা রাত্তিরের আড্ডা। দেশবাড়ির কথা শুনিয়েছিলেন। কোনও এক সিদ্ধ পুরুষ কিছুদিন ছিলেন। অলৌকিক নানা কাহিনী জড়িয়ে গেল তার সঙ্গে। শিশু বটুকের উৎসাহ ক্রমেই বাড়ছে। দু'ভাই মিলে কাকভোরে বেড়িয়ে পৌঁচেছেন নদীর ঘাটে। ভোরের আলো ফোটেনি। রাত্তিরের অন্ধকার স্তিমিত। নদীর পারে উলঙ্গ সাধু নেতিধোতি করছেন। এমন গায়ে কাঁটা দেওয়া ঘটনা! তাও আবার ঘটছে কিনা দুই শিশু দর্শকের সম্মুখে। হঠাৎ টের পেয়ে গেলেন। হেঁকে উঠলেন এখন না, এখানে না! পালা, পালা! বড় কঠিন সাধনা। কারুকে ভুলেও বলিসনা যেন। সাধুর ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলার নির্দেশ অমান্য করার উপায় ছিল না।

আর একদিনের কথা। তখুনি নারকোল নাড়ু তৈরি হয়েছে। এনে দিতেই বল্লেন— গন্ধটি বড় খাসা হয়েছে! ভাবছিলাম পাবনা, পাবনা। আরে, দেখছি একেবারে পাবনার খাঁটি স্বাদ। নাড়ুতে কর্পূর দিয়েছিলাম। দ্বিতীয় পাবনা মানে দেশের কথা। শেতলাই স্মৃতি। এমনি গান করতেন কথায় কথায়।— বল কর, বল ধর, বলে যে কোনও পিকনিকে খোলার আসরে মেতে উঠতেন। সংসদের তিন সদস্য— নীলু বল, সুপ্রিয় ধর ও অলক করের— পদবী নিয়ে বাঁধা ছড়া। অনায়াসে এমন ছড়া মুখে মুখে ফিরতো। ডি. আর. সেনকে নিয়ে বাঁধা ছড়ার আনন্দ কেনা উপভোগ করেছে। ডি. আর. ইউ আর সো নিয়ার, আই হ্যাভ নো ফিয়ার— বড়রা কেউ বাড়িতে না থাকলেও কোনও অসুবিধা নেই। সব বয়সের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে নিতেন। ছোটদের উপযোগী গল্প বানিয়ে নিতেন। ক্রিকেটের মাঠ, দুকূল ছাপানো বর্ষার পদ্মা— কত যে প্রসঙ্গ! একবার ডিঙ্গি নৌকায় রাত্তিরে পদ্মাবক্ষে কেমন পথ হারিয়েছিলেন।

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ সালে, নতুন দিল্লির "কমোলবাষা বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দ্র সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

অনুমানে বাবা লোক পাঠাতে সে যাত্রায় রক্ষা। কিংবা ইউনিভারসিটিতে ইংরেজি অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষের সেক্সপীয়ারের ক্লাস। হলেন সেক্সপীয়র অনুরাগী অবশেষে। ছোট শিশু দাপিয়ে হামা দিচ্ছে। মাদুরে বসে চলছে জলযোগ। হঠাৎই কেমন হয়ে গেলেন। চুপচাপ তাকিয়ে। শিঘঘির কাগজ আনো, কলম কোথায়। জন্ম নিল অসাধারণ কবিতা— 'পরে হয়তো প্রেমে ডুবে যাবে।' বাড়ির ছোট্ট খোলা সম্মুখখানি ভারী পছন্দ গন্ধরাজ ফুলের গাছটি অনেকখানি হাত পা মেলে দিয়ে ভারী সুখী যেন। সন্ধ্যের পর মনোরম। গাছ ভরতি ফুলে ফুলে আলো। যেমন নাম তেমনি কাম। মন আকুল করা গন্ধ। ফুলগুলি যেন তারা। বটুকদা বলতেন, চাঁদ তারা নিয়ে আকাশখানি নেবে এসেছে। অমনি গান হ'লো—'আকাশ ভরা সূর্য তারা'।

এখানে ঘটলো একদিন ভারি মজা। সেদিনে স্বনামধন্য এক ব্যক্তি এসেছেন। পেশাগতভাবে চিকিৎসক। সাহিত্য অনুরাগী ও শিল্পী। বহুগুণের একত্র সমাবেশ। নাম রেখেছিলাম বনফুল। সাক্ষাতেই ডাকতাম। উপভোগ করতেন। তখন একটি কবিতাসঙ্কলন ছাপা হয়েছে। বড়সড় একটি প্যাকেট সঙ্গে আছে। উদ্দেশ্য সংসদের মধ্যে বইটি বিক্রি। ভারটি বইতে হবে গৃহকর্তাকে। কারণ তিনি একাধারে প্রথমত চিকিৎসক, দ্বিতীয়ত কবি, তৃতীয়ত নাট্যকার, চতুর্থত, ইত্যকার বলেই চলেছেন। এ বই সংগ্রহে কারুর কার্পণ্য থাকা উচিত নয়। সামনে বসে বটুকদার কি ছটফটানী। প্রায়ান্ধকার ফুলের গাছটির আশপাশ জুড়ে স্বল্প আসর জমে উঠেছে। বটুকদা প্রায় ঝাঁপিয়ে এসে পড়লেন— আর বলা গেল না। চায়ের কাপটি ফেলেই পালিয়েছি। ভদ্রলোক ছাপাসন্ন কবি বটে, ভাবাপন্ন নন।

এমনিভাবে তাঁকে ঘিরে আমাদের কত যে আনন্দ ছিল। ছিল কত অনুষ্ঠান। বলে শেষ করা যাবে না। এ সময়ে স্ত্রী উর্মিলাদেবীর মৃত্যু ঘটে। শোক বড় বিষণ্ণ করে তুলেছিল তাঁকে। বাইরে কোনও প্রকাশ নেই। ভেতরে ভেতরে নির্ভরের ভীত নড়ছিলো। নিঃসঙ্গতা অনুভব করতেন। যেন শেকল ছেঁড়ার প্রস্তুতি। একদিন কৃষ্ণান ছিলেন সঙ্গে। বটুকদার কাছে গেছি। উঠে এসে হাত মেলাবেন। উই আর সেইলিং ইন দ্যা সেম বোট। মাসকয়েক, কৃষ্ণান পত্নী পার্বতীর মৃত্যু হয়েছে।

বৌদির অসুস্থতার কারণে বাড়ির ক্লাস বন্ধ হ'ল। এখানে ওখানে শেখাচ্ছিলেন। যতদূর মনে করতে পারি এভাবে ইতস্তত চেষ্টা না চালিয়ে সংঘবদ্ধভাবে সঙ্গীত শিক্ষার কাজে বেঙ্গল এসোসিয়েশন অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। বঙ্গীয় সংসদ ও মন্দিরমার্গের রাইসিনা স্কুলে বেঙ্গল এসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে ক্লাশ আরম্ভ হয়। শুধুমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়, অন্যান্য গান শেখানোর ব্যবস্থা হ'লো। কয়েকজন শিক্ষক নিযুক্ত হ'লেন। সর্ব প্রধান হয়ে বটুকদা। বাড়ির ক্লাশটিতে বড় ঘরোয়া ভাব ছিল। শিক্ষার কাঠিন্য নয়। কেবল শেখার আনন্দ। রবীন্দ্রসঙ্গীত ভিন্ন অন্য গানে হয়তো শিক্ষার্থীদের উৎসাহ তেমন ছিল না। সময়ের মধ্যে ভাগাভাগি পছন্দ হয়নি। ধীরে ছাত্রসংখ্যা কমতে থাকল। তবু চলছিলো কিছুদিন। আগেই বলেছি অতি স্পর্শকাতর ছিলেন। শিল্পীর যেমন লক্ষণ। মনের সায় কমছিলো। কোলকাতায় তার অনুরাগীর সংখ্যা কম নয়। বৌদি থাকতেই বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। মাতৃহারা ছোট কন্যা চলে গেল কলকাতার আত্মীয়দের মধ্যে। বুঝতে পারছিলেন অমোঘ সত্য— 'বন্ধনে দিয়েছে ধরা শুধু ছিন্ন করিতে বন্ধন।' দিল্লীর বন্ধন ছিন্ন করবার সময় আগত। কোলকাতা থেকে কিছু প্রস্তাব এলা। দিল্লীর পাট তোলার আয়োজন হ'ল।

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ২০০৯ সালে, নতুন দিল্লির "কত্থালবাসা বঙ্গীয় সংঘ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নবেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

বঙ্গীয় সংসদের নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যে সংযোজিত হ'ল পৌষমেলা সীড এ পার্কে তিনদিনব্যাপী এক যজ্ঞি বাড়ি। নানা আয়োজনে মুখরিত মেলা। প্রথম থেকেই খুবই জনপ্রিয় হ'লো। এই মেলাতেই গুণীজন সম্বর্ধনা করা স্থির হ'ল। দিল্লীর এত সংস্থার মধ্যে এই প্রয়াসে করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ পথিকৃৎ। বটুকদাকে আর ধরে রাখা যাবে না। বুঝেছিলেন সকলে। রাজধানী পর্বের ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কবিতা একত্রিত ভাবে একটি সংকলন প্রকাশের প্রস্তাব নিল সংসদ। সে বছরে বটুকদা গুণীজন নির্বাচিত হ'লেন। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে আমাদের পত্রিকার নামকরণ বটুকদার। হাতে লেখা কাগজ পিন করে দেয়ালে ঝুলিয়ে পত্রিকার প্রকাশ। নাম তাই অজন্তা। তার লেখা অজন্তা কবিতা দিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ। সংকলন প্রকাশের প্রস্তাবে খুব খুসি। ঘরে বসে কবিতার বাছাই চলছে। চলেতো যাবেনই, যাবার আগে সংকলনটি প্রকাশে সকলেই মেতে উঠলেন। কবিতা সংগ্রহ হবার পর বটুকদার নিজের কাছে রাখা বড় গদ্যকবিতা কোতোয়াল নিয়ে এলেন, ক্লাবের তখনকার আর্থিক সংগতি এমন নয় যে একটি প্রকাশনার দায়িত্ব নেওয়া চলে। যখন থেকে অজন্তা ছাপা হয়, সংসদ সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করে চলেছে। বিক্রি করা হতো না। কিন্তু অবনীদা যেখানে কর্ণধার সেখানে চিন্তা বা উদ্বেগের ভার ছিলো না। যে কোন আয়োজনকে সার্থক করে তোলাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁরা সকলেই সহমত হবেন। প্রচ্ছদ নিয়ে ভাবনাচিন্তা। সংকলনের ভেতর ও বাইরে যেন একসুরে বাঁধা হয়। সৃষ্টি যেন না হয় আহত। শিল্পীবন্ধু জ্যোতি দত্তগুপ্ত এগিয়ে এলেন। বটুকদার খুব পছন্দ হ'ল প্রচ্ছদ।

বহুজন সমাবেশে সেবারের সভা জমজমাট। নির্দিষ্ট আসরে 'যে পথেই যাও' প্রকাশিত হলো। সভায় পৌরহিত্য করেন অসাধারণ বাগ্মী, সম্প্রতি প্রয়াত প্রফেসর হীরেন মুখোপাধ্যায়। নিকট সান্নিধ্যের কথা বলেছিলেন অবনীদা। বলেছিলেন, যেতে গিয়েও যাওয়া হ'লো না বটুকদার। অক্ষর বন্ধনে আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন। আমাদের ভালোবাসার জয় হ'লো। সভাশেষে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডল সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে। টেবিলের ওপর রাখা গোছা ধরা 'যে পথেই যাও।' বটুকদার নিজের হস্তাক্ষর সহ বই সংগ্রহ করতে আগ্রহী সকলে। কারুকে নিরাশ করেননি। অবশেষে মালাগলায়, হাতে বই নিয়ে আমাদের বটুকদা সহ সভার অবসান শেষে বাড়ির পথ ধরলাম। সবাই একসঙ্গে এলেন। নগেনদা, শিবদা, রেবতীভূষণ। সকলের আনন্দ হাসির মঞ্চে যেন তিনি একটু একা। চা নিয়ে এসে দেখি বটুকদা নেই। পাশের প্রায়ান্ধকার ঘরে একা বসে। গলায় মালা, হাতে বই। দুচোখ বোজা। বেয়ে নাবছে জলের ধারা। মনে মনে চাইছেন চিরদিনের সঙ্গী। সুখদুঃখের অভিন্ন সঙ্গীকে। যার গলায় পরাবেন এ মালা। সম্মানের স্মারক। চায়ের কাপ হাতে ধরিয়ে, আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিলাম। মানুষটিকে বেশিক্ষণ একা রাখা ঠিক হবে না। ফিরে আসতেই হবে জীবনের কাছে। জীবনের দাবির কাছে, কোলাহলের কাছে। বল্লাম, সকলে অপেক্ষা করে আছেন। উঠিয়ে নিয়ে এলাম। বন্ধুরা আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন। বন্ধুত্বের, আত্মীয়তার ছবিখানি উদ্ভাসিত যেন। গান শুরু হ'লো। অনেক গান, অনেক গল্প। এ মনিহার তো ছিলই, আকাশ জুড়ে শুনিনু, আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ, কি গাব আজ কি শোনাবো— এমনি কত। রেবতীবাবু সুগায়ক। কথায় ও সুরে দ্বিপ্রাহরিক আসর যেন হীরকপ্রভ।

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ সালে, নতুন দিল্লির "করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিস্মিতা মৈত্রর "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থে, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

আর এক সান্ধ্য আসর। চলে যাওয়া স্থির। বাসা গুটানো, রেলের টিকিট— আয়োজন সব পাকা। আমার বাসায় নৈশভোজনে মিলনোৎসব। দু'একজন অতিথি বাড়লেও মোটামুটি সকলেই বটুকদার নিকটজন। নানা কথা, নানা আলোচনা। সকলেই মশগুল। কিন্তু সকলের মনের মধ্যে যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন যেন বয়ে চলেছে। আবার কবে দেখা হবে। কার হাতে রইল কতদিনের মেয়াদ। গান হ'লো কত অজানারে জানাইলে তুমি; প্রথম আদি তব, পুরানো সে দিনের কথা, আজি মর্মরধ্বনি কেন জাগিলরে। কিছু মনে পড়ে। নিত্য ধাব্যমান জীবন। না জানি কতবার খুলেছি স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার— ভুলেছি কত কথা, কত সান্নিধ্য। বিকিয়েছি অমূল্যরতন। কাল বড় কঠিন। বড় নির্মম। তার মধ্যে ক্ষণিক কিছু মুহূর্ত বড় অবুঝ। কৃপণের মত আগলিয়ে রাখে স্মৃতির কোলে দিতে পারে না।

আমি বলেছিলাম সবাই মিলে গাইবো, ভরা থাক স্মৃতিসুধায় অন্য গানগুলির মত বটুকদা গুনগুনিয়ে উঠলেন প্রস্তাবমাত্র। তার প্রাণে যে গানের জোয়ার। রে-রে করে উঠলেন রেবতীবাবু। ঘোর আপত্তি। বাদ সেধেছে, সঞ্চারীর দুইকলি। 'যে পথে যেতে হবে সে পথে তুমি একা'। প্রাণে ধরে এ গান কেমন করে গাই! বটুকদা যেখানেই থাকুন, আমাদের কাছছাড়া নয়। বিদায় দিতে পারবো না। তিনি যেমন আমাদের, আমরা চিরকাল চলবো একসঙ্গে। একা চলার কোনও পথ নয়, কোনও পথ নেই। অবশেষে গানের পরিবর্তন। হাসি ফুটলো সকলের মুখে।

কথা যে কত সত্যি। আমরা কেউ একা নই। চির পথিক চলেছেন তিনি আমাদের সঙ্গে। কত চিঠি লিখেছেন। কত তার শুধুই কবিতা। অজন্তার দাবি ছিল সবার আগে। ছিল কত অভিনব কল্পনা। নতুন আবাসনে পাখীর মত বাসা বাঁধবেন। আমরা সব প্রতিবেশী হ'ব। গাছের ডালে বাসা হবে। পাখির মত থাকা। পাখীরা যেন না পায় কোনও ভয়। তাদের মতো সুরে বেঁধে কথা কইতে হবে। অভ্যাস করলে নিশ্চয়ই পারবো, নতুন আবাসনের নাম রেখেছিলেন— 'কর্ষণী' লিখতেন, বৃদ্ধ বয়সের প্রেম।

আর দেখা হয়নি। কল্পনার সেই পাখীর বাসাটি পড়ে রইল পেছনে। কখন নিঃশব্দে উড়ে গেল কোতোয়াল পাখী—

অনেক দূরের বনের দিকে— ঘন সবুজ পাতার বন— অসংখ্য বর্ণালী
ঘেরা আকাশ পাহাড় আর মাটি।
এবার নিশ্চিহ্ন হয়ে ডুবে যাবো আম্নি অরণ্য-সমুদ্রে— যেখানে
মানুষেরা থাকে না, অনুরা থাকে না॥

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "কত্রালবাসা বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থে, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।